মানুষকে বাদ দিয়ে বাদাবন সংরক্ষণের চেষ্টা অবাস্তব

ড. সুজিত চক্রবর্ত্তী

সুন্দরবনের সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৬৯ এ একটি প্রাণি সমীক্ষার সূত্রে। তারপর বিগত ৪২ বছরে সরকারী বেসরকারী কাজের সূত্রে বা নিজের খেয়ালে বার বার এসেছি এই নদী নালার দেশে। ইতিমধ্যে এক সময়ের অবহেলিত সুন্দরবনের বাদাবন, জীব বৈচিত্র্য, প্রকৃতি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ধীরে ধীরে ভারত তথা বিশ্বের মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নানা পরিকল্পনা, নির্মাণ, গবেষণা, সংরক্ষণে সুন্দরবনের উন্নয়নের প্রচেষ্টা আজ প্রচারের আলোয় আলোকিত। ক্রমবর্ধমান পর্যটকে সুন্দরবন সদাই ব্যস্ত। কিন্তু কোন গুরুগম্ভীর আলোচনা নয়, সুন্দরবনের সাথে সামান্য পরিচিত এক প্রবীণ মানুষের দেখা কিছু ঘটনা আর অনুভূতি প্রসঙ্গে এই লেখার অবতারণা।

১৯৬৯ এ দয়াপুর গ্রামের হাটে প্রায় তিনদিক খোলা, অব্যবহৃত দোকানঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম। গ্রামের অন্য সবার মত রান্না ও খাবার জল নিতাম একটি মিষ্টি জলের পুকুর থেকে। সেই পুকুরের আঘাটার দিকে জলের উপর ছিল বাঁশ আর চাটাই দিয়ে তৈরি মহিলাদের কটি শৌচাগার। এত বছরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার আর প্রকৃত পানীয় জল অনেক মানুষের কাছে আজও অধরা।

সম্ভবত ১৯৭৭। বাসন্তী থেকে লঞ্চে উঠেছিলাম ক্যানিং যাবার জন্য। যথেষ্ট ভীড়। তার মধ্যে ডেকের উপর কিছুটা ফাঁকা জায়গায় একটি ১৫-১৬ বছরের কিশোর প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে কিছু উদ্বিগ্ন, অসহায় পরিজন। শুনলাম গত সন্ধ্যায় ছেলেটিকে সাপে কেটেছে। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার থাকলেও প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই। তাই চিকিৎসার জন্য তাকে ক্যানিং নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জানি না হতভাগ্য ছেলেটি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল কিনা। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই প্রয়োজনীয় প্রাণদায়ী ওষুধ অমিল। বিপন্ন রোগীকে নদী নালা পেরিয়ে নিয়ে যেতে হয় দূরের কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে।

একটা সময় ছিল যখন সুন্দরবনের নদী নালায় দেখতাম অসংখ্য মানুষ বিশেষত মহিলা ও কিশোর কিশোরী কোমড় জলে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট জাল দিয়ে মীন (চিংড়ি চারা) সংগ্রহ করছে। মীন ধরায় মগ্ন মানুষ বাঘ-কুমীরের সহজ শিকার। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন এই পদ্ধতিতে মীন সংগ্রহের ফলে জীববৈচিত্র, বাদাবন ও নদী বাঁধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। বিকল্প জীবিকার অভাবে, দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মীন শিকারের প্রবণতা হ্রাস পায়নি। কিন্তু ইদানিং মীনের চাহিদা ও বাজার মূল্য কমে যাওয়াতে অনেকেই এই জীবিকা থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে মীন শিকারীরা কি কোন সুস্থ বিকল্প জীবিকা খুঁজে পেয়েছেন?

পত্র পত্রিকায় দেখি, আলোচনা সভায় শুনি সুন্দরবনে নদীর জলে ক্রমবর্ধমান নোনাভাবের জন্য বাদাবন আর জীববৈচিত্র্য বিপন্ন। শুধুমাত্র নোনাভাব বৃদ্ধি নয়, নদীর জলে আরেকটি বিপদ ধীরে ধীরে

তার ছায়া ফেলছে। চাহিদার কারণে গত কয়েক দশকে সুন্দরবনে ডিজেল চালিত জলযানের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিয়ত পোড়া তেলে দূষিত হচ্ছে নদীর জল। বিশেষ করে ঘাটগুলোর কাছে জলের স্বাভাবিক রঙ মুছে গিয়ে কালো তেলের আস্তরণে ঢাকা পরছে। সামগ্রিক ভাবে বড় কোন বিপর্যয় রোধে তেল থেকে জল দূষণ প্রতিরোধ এই মূহুর্তে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া দরকার।

২০১০ এ সুন্দরবন গিয়েছিলাম বনদপ্তরের আমন্ত্রণে উদ্দেশ্য ছিল পর্যটকদের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করার জন্য কিছু ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া। ট্রেনিং প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা রোটেশান ভিত্তিতে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু দিনের জন্য কাজ পায়। ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত। আলোচনা করে বুঝেছিলাম ওরা অনেকেই সুন্দরবনকে আমার চেয়ে ভালভাবে চেনে এবং বোঝে। এই সব উজ্জ্বল ছেলে মেয়েরাও সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শকের কাজ পেতে আগ্রহী। মানব সম্পদ অপচয়ের এতবড় উদাহরণ বোধ হয় অন্য কোন জায়গায় পাওয়া যাবে না। সুন্দরবনে বিভিন্ন উন্নয়ণ, নির্মাণ বা গবেষণামূলক প্রকল্পে এই সব ভূমিপুত্রদের সহকারী হিসাবে নিয়োগ বাধ্যতামূলক হলে হয়ত এই অপচয় কিছুটা রোধ করা যেত। এই ট্রেনিং এর সময় একজন মানুষের সাথে আলাপ হয়েছিল। চোরাশিকার ও নানা বেআইনি কাজের জন্য মানুষটির সাথে বনদপ্তর পুলিশের সংঘাত ছিল নিয়মিত ব্যাপার। একটি বেসরকারী সংস্থার অনুপ্রেরণায় সেই মানুষটি আজ বাদাবন সংরক্ষণ এবং চোরাশিকার প্রতিরোধের প্রতীক। একটু সহানুভূতি, সমবেদনা, উদরতা আর সহায়তায় সুন্দরবনের অনেক বিপথগামী মানুষকে বোধ হয় মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সুন্দরবনের সাথে পরিচিত সবাই জানেন মাছ ধরা নৌকা আর বনরক্ষীদের মধ্যে একটা চোর পুলিশ খেলা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বেশি মাছের আশায় নৌকা সংরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। বনরক্ষীদের নজরে এলে জাল-মাছ-নৌকা সবকিছুই বাজেয়াপ্ত হয়। আর পরিবারের মানুষদের জন্য কয়েকদিনের অনাহার হয় ভবিতব্য। কিন্তু কেন এই মানুষগুলো হাজার বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সংরক্ষিত অঞ্চলে আসতে বাধ্য হয় সেই প্রশ্ন কেউ তোলে না। এই প্রসঙ্গে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত ড ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করতে চাই। ১২ নভেম্বর, ২০০২, এক সামুদ্রিক ঝড়ের সময় একটি মাছ ধরা নৌকা জম্বুদ্বীপের বিশালাক্ষী নদীর খাড়িতে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। বনরক্ষীরা সংরক্ষিত অঞ্চলের অজুহাতে নৌকাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। ফলস্বরূপ সেই নৌকার ১১ জন মাছ শিকারী ঝড়ের প্রকোপে চিরদিনের মত হারিয়ে যায়। ১৯৭৯ এ বাঘের বাসস্থান রক্ষার জন্য প্রায় ৪০০০ মানুষকে মরিচঝাঁপি থেকে নির্মম ভাবে বিতাড়িত করা হয়। সেই ক্ষতবিক্ষত মানুষদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মানবঅধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলিও বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

পৃথিবী জুড়ে বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য তথা প্রকৃতিকে সংরক্ষনের জন্য বিশাল ব্যয়সাপেক্ষ নানা কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা চলছে। বাস্তুতন্ত্রের জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা, প্রাণি সবকিছুই গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম উপাদান মানুষ অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। বাদাবন সংরক্ষনের গুরুত্ব বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষ বাদাবন বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মানুষকে বাদ দিয়ে বাদাবন সংরক্ষন অবাস্তব প্রচেষ্টা। কিছুদিন আগে কোলকাতার ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাশে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম - 'কোলকাতাকে বাঁচাতে সুন্দরবনকে বাঁচান'। শ্লোগানটা একটু পরিবর্তন করে 'সুন্দরবনের মানুষের জন্য সুন্দরবনকে বাঁচান' করলে বোধ হয় অনেক বেশি সার্থক হত।

লেখক জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা।

ছবি ঃ অজয় কোনার